শান্তিনিকেতন ঃ অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যৎ

শিবনারায়ণ রায়

ইচ্ছা আর ইচ্ছাপূরণের মধ্যে ব্যবধানের কথা আমরা সকলেই জানি। লঙ্কের রাবণের ইচ্ছা ছিল স্বর্গের সিংহদ্বারে পৌঁছবার উপযোগী একটি সিঁড়ি মর্ত্যভূমি থেকেই গড়ে দিয়ে যাবেন। পারেন নি, আর তাই শেষ নিশ্বাস ফেলবার আগে বলে গিয়েছিলেন, বাছা, জীবনে কিছু যদি করতে চাও সে কাজ ফেলে রেখো না, আর ইচ্ছাটাই যথেষ্ট নয়, আরো কিছু ল াগে।

ইচ্ছা ছাড়া আরো কী কী লাগে? প্রথমত দরকার কী চাই নিজের মনের মধ্যে তার একটা স্পষ্ট ধারণা। চাওয়াটা ছোট ম াপের হলে এটা খুব কঠিন কাজ ঠেকে না। ছোট বলতে আকারের কথা বলছি না, নিহিতার্থের কথা বলছি। শিশুরা খেলন া চায়, বড়রা টাকাকড়ি প্রভাবপ্রতিপত্তি চায়, এ ব্যাপারে অস্পষ্টতা নেই। কিন্তু যাঁরা চান সমাজে স্বাধীনতা, সাম্য, ন্য ায়নীতির প্রতিষ্ঠা তাঁদের সেই চাওয়ার মধ্যে বিস্তর প্রশ্নের সম্ভাবনা রয়ে যায় যাদের উত্তর মেলা মোটেই সহজ নয়। স্বাধীনত া কি স্বেচ্ছাচারিতা অথবা অনন্যতন্ত্রতা ?সমাজবদ্ধতার প্রয়োজনে কোথায় তার লক্ষণরেখা? সাম্যের অর্থ কি সব মানুষকে কাটছাঁট করে গড়পড়তায় পর্যবসিত করা? তার ফলেকি প্রত্যেক মানুষের অস্মিতা অবলুপ্ত হবে না।? যাঁরা প্রতিভাবান, বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে জ্ঞানীগুণী অথবা দক্ষতার অধিকারী তাঁদেরক্ষেত্রে কীভাবে সমতার প্রয়োগ ঘটবে? ন্যায়নীতির কি নিত্য কোনো নির্ণায়ক আছে? অথবা যুগে যুগে, সমাজে সমাজে, শ্রেণীতে শ্রেণীতে, গোষ্ঠীতে গোষ্ঠীতে, এমনকি ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে নৈতিকতার মাপকাঠি বিভিন্ন? অধিকাংশ স্ত্রীপুষ সম্ভবত এ সব নিয়ে মাথা ঘামাননা। কিন্তু এই সব আদর্শের প্রতিষ্ঠাই যাঁদের জীবনের প্রধান ইচ্ছা তাঁরাও যদি এ সব নিয়ে না ভাবেন, তাহলে তাঁদের অপরিস্ফুট ইচ্ছার বাস্তবায়নের কোনও সম্ভাবনা দেখি না। তাঁদের নিজেদের কাছে এবং অন্য মানুষদের কাছে স্পষ্ট করা দরকার তাঁদের ইচ্ছার যথার্থ চেহারাটি কেমনতর। দ্বিতীয়ত, ইচ্ছা করাই তো যথেষ্ট নয়, তা পূরণের জন্য সামর্থ্য অর্জনও তো দরকার। কমবেশি কিছু সামর্থ্য নিয়েআমরা সকলেই জন্মাই। তাদের বলাধান এবং সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য নানাবিধ সামর্থ্য অর্জন শিক্ষা, অধ্যবসায় এবং সাধনার উপরে নির্ভর করে। সামর্থ্য বিহনে ইচ্ছা রয়ে যায় আকাশকুসুম, এবং ব্যর্থতা - বিড়ম্বিত ইচ্ছক অনেক সময়ে হয়ে ওঠেন ঘোর শুভনাস্তিক। তৃতীয়ত,পরিবেশের সহায়তা যেমন কোনো কোনো ইচ্ছাপূরণকে সহজতর করতে প ারে, তেমনই পরিবেশের বিরোধিতা খুব প্রবল হলে ইচ্ছার মূলে ঘা মেরে তাকে উৎপাটিতও করতে পারে। এ দেশে চার্ব াকপন্থীদের বিলুপ্তি সাধনের কথা আমরা জানি। পশ্চিমে সত্রেটিশ থেকে জ্যোর্দানো ব্রুনো --- ভাবুক শহীদদের সংখ্যা নিতান্ত কম নয়। তাঁদের চিন্তায় অস্পষ্টতা অথবা ব্যক্তিগত সামর্থ্যের অভাব ছিল না, কিন্তুসামাজিক - সাংস্কৃতিক পরিবেশ ছিল প্রবলভাবে প্রতিকূল। সাধারণ মানুষের জীবনে প্রতিকূল পরিবেশের চাপে ব্যক্তিগত ইচ্ছার বিলোপ প্রায়ই ঘটে।

শান্তিনিকেতন সম্পর্কে লিখতে বসে এসব কথা উল্লেখ করার কারণ সেখানে একজন খুব বড় মাপের ভাবুক একটি অর্ধস্ ফুটইচ্ছা নিয়ে পরীক্ষা শু করেছিলেন, যেটি সাধনার ভিতর দিয়ে একটি খুব মহৎ, প্রায় অতুলনীয় উদ্যোগের রূপ নিয়েছিল এবং শেষ পর্যন্ত যেটি নানা কারণের সমাবেশে আপজাত্যের কাছে হার মানে। গোড়াতেই বলে রাখি, সেই উদ্যোগ আজও আমার কাছে মহা মূল্যবান মনে হয় এবং মানবতন্ত্রী শিক্ষক হিসেবে তা থেকে আমি এখনও গভীর প্রেরণা পাই। তবে সঙ্গে সঙ্গে স্বীকার না করে পারি না যেবর্তমানের শান্তিনিকেতনে সে উদ্যোগের প্রায় কিছুই অবশিষ্ট নেই। এবং

যদি এ দেশে কোনো বড় মাপের ভাবান্দোলন এখনও না দেখা দেয় এবং বিশেষ উদ্যোগী এবং বিচক্ষণ কিছু স্ত্রীপুষ যদি না পুনর্জ্জীবনের দায়িত্ব নিয়ে এগিয়ে আসেন, তাহলে সেই দুঃসাহসিকও উদ্ভাবনা - সমৃদ্ধ রবীন্দ্র - প্রয়াস হয়তো ভীড়াক্রান্ত ইতিহাসের কোনো অবহেলিত কোণে বিলুপ্তির অপেক্ষায় পড়ে থাকবে।

নিজের স্কুলজীবনের সংক্ষিপ্ত এবং তিক্ত অভিজ্ঞতার ফলে রবীন্দ্রনাথ মধ্যজীবনের সূচনায় ইংরেজপ্রবর্তিত আধুনিক শিক্ষারবিকল্প হিসেবে একটি ব্রহ্মচর্যাশ্রম গড়বার উদ্যোগী হন। তখন তাঁর ইচ্ছা যতটা নিখাদ ছিল সম্ভবত ততটা সুচিন্তিত অথবা পরিস্ফুট ছিল না। অনুমান করি, তিনি বিবেচনা করে দেখেন নি যে তাঁর পূর্বসুরী যে দুজন মনীষীকে তিনি সবিশেষ শ্রদ্ধা করতেন --- রামমোহন এবং বিদ্যাসাগর -- তাঁরা কেন সোৎসাহে পশ্চিমাগত শিক্ষাকে স্বাগত করেছিলেন --- কেন বেদান্তকে ভ্রান্তজ্ঞান করে ঈশ্বরচন্দ্র জন স্টুয়ার্ট মিলের উপরে জোর দিয়েছিলেন। এ কথাও তাঁর স্মরণে হয়তো আসে নি যে ইংরেজপ্রবর্তিত আধুনিক শিক্ষা বঙ্কিমীপ্রতিভার পরিপূর্ণ বিকাশে বাধা না ঘটিয়ে স্পষ্টতই সহায়ক হয়েছিল। অপরপক্ষে প্রাচীন কালের তপোবন সম্পর্কে তাঁর মনে যে অপরিস্ফুট রোম্যান্টিক কল্পনা ছিল ইতিহাসে তার সমর্থন মেলা কঠিন। ব্রহ্মচর্যাশ্রম ব্যবস্থা দাঁড়িয়েছিল উচচবর্ণ নিম্নবর্ণ ভিত্তিক সমাজে ব্রাহ্মণ আধিপত্যের উপরে; সেখানে নিম্নবর্ণের কোনো স্থান ছিল না; এবং নারীরাও ছিলেন নির্বাসিত। তাছাড়া সেখানে গুশিষ্যপরম্পরায় প্রাপ্তার্থ প্রত্যয়কে পরাজ্ঞান বলে ধরে নেওয়া হত এবং ফলে বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা নিরীক্ষার আদৌ কোনো সুযোগ সম্ভাবনা ছিল না। ব্রহ্মচর্যাশ্রমের মধ্যে যদি মূল্যবান কিছু থেকে থাকে সেটি হল তপ মনকে প্রকৃতির সঙ্গে আত্মীয় বন্ধনে যুক্ত করবার চেষ্টা। সম্প্রতিকালে প্রকৃতিপরিবেশ -এর নিজস্ব মূল্য সম্পর্কে যে চেতনা ক্রমে গড়ে উঠছে শান্তিনিকেতনের আদিপর্বে ব্রহ্মচর্যাশ্রম গড়বার প্রচেষ্টার মধ্যে তারই কিছুটা আভাস হয়তো মেলে।

সৌভাগ্যবশত মধ্যজীবনে পা দিয়ে রবীন্দ্রনাথ স্থিতপ্রজ্ঞের স্থানুতায় আটকে যান নি। পরবর্তী দশকগুলিতে তাঁর সৃজনপ্রতিভা যে বিচিত্র পথে আত্মপ্রকাশ করে চলেছে, তাঁর চিন্তা এবং প্রাতিষ্ঠানিক পরীক্ষা নিরীক্ষাও নানা রূপান্তরের মধ্য দিয়ে বিকশিত হয়েছে। শান্তিনিকেতনে শিক্ষাব্যবস্থার বিকাশ ব্রহ্মচর্যাশ্রমের মধ্যে দ্ধ থাকে নি। এদিকে রবীন্দ্রপ্রতিভার আকর্ষণে এবং প্রভাবে সেখানে গড়েউঠেছিল একটি চিমান এবং সংস্কৃতিমান সমাজ যার পরিবেশ গ্রামীণ কিন্তু যার ভাবপরিমণ্ডল না গ্রাম্য না শহুরে। অন্যদিকে সেই পরিবেশকে দীর্ঘদিন প্রাণবন্ত করে রাখে এমন একটি বিকাশধর্মী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান যার তুলনা এ দেশে কেন অন্য দেশেও মেলা ভার। প্রায় তিরিশ বছর ধরে নিষ্ঠিত প্রয়াসে নানা রূপান্তর এবং পরীক্ষা নিরীক্ষার ভিতর দিয়ে রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে শিক্ষা এবং জীবনযাপনের এমন একটি মডেল গড়ে তোলেন একুশ শতকের পৃথিবীতে যাকে মোটেই কালবিদ্ধ ঠেকে না, বরং পথনির্দেশক মনে হতে পারে।

এই মডেল নিয়ে অন্যত্র আলোচনা করেছি। এখানে সংক্ষেপে সূত্রাকারে তার কয়েকটি বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করি। রবীন্দ্রনাথের অনুভবে মানুষ এবং বিশ্বপ্রকৃতি পরস্পরে প্রবাহিত। শান্তিনিকেতনের জীবনযাত্রায় এবং শিক্ষাব্যবস্থায় মানুষ এবং প্রকৃতির মধ্যে প্রীতিস্নিগ্ধ পারস্পরিকতার চেতনাকে তিনি প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন। শিক্ষার উদ্দেশ্য মনুষ্যত্বের বিকাশ। জ্ঞানচর্চা তার একটি প্রধান অঙ্গ, কিন্তু একমাত্র এমন কিছু মুখ্য অঙ্গও নয়। কল্পনা এবং সৃজন মানুষের সহজাত বৃত্তি। মনুষ্যত্বের বিকাশের জন্য চাই কল্পনার স্ফূর্তি এবং সৃজনের বিভিন্ন পন্থায় পারদর্শিতা অর্জন। অক্ষর আবিষ্কারের অনেক আগে থেকেই মানুষমানুষীর কল্পনা এবং সৃজনীসামর্থ্য প্রকাশ পেয়েছিল নাচে, গানে, ছবিতে। যেমন প্রকৃতিপরিবেশের সঙ্গে আত্মীয়তা তেমনই বিভিন্ন কলাবিদ্যার চর্চাকে রবীন্দ্রনাথ শিক্ষার এবং জীবনচর্যার অচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসেবে প্রাধান্য দিয়েছিলেন। কলাভবন এবং সঙ্গীতভবন তো বটেই, অভিনয় এবং বিভিন্ন ঋতু - উৎসবকেও তিনি শিক্ষার প্রাণদায়িণী শক্তি হিসেবে জেনেছিলেন।

অপর দিকে তিনি চেয়েছিলেন পড়ুয়াদের মনে সামাজিক দায়িত্ববোধের সঞ্চার করতে। শান্তিনিকেতনের চারপাশ ঘিরে যে সব গ্রাম আছে তাদের বিকাশ এবং উন্নয়নে শান্তিনিকেতনের ছাত্রছাত্রী এবং অধিবাসীদের একটি অবশ্যকরণীয় ভূমিকা আছে, এটিও তাঁর দৃষ্টিতে অস্পষ্ট ছিল না। জীবনের শেষ পর্বে তাই তিনি শ্রীনিকেতনের কার্যকলাপের উপরে বিশেষ জোর দিয়েছিলেন। তিনি চেয়েছিলেন ছাত্রছাত্রীরা নানা রকমের হাতের কাজ শিখবে, গ্রামের মানুষদের সঙ্গে বিবিধ উদ্যোগের সূত্রে যুক্ত হবে। অপরপক্ষে গ্রামবাসীরাও প্রকৃষ্টতর প্রয়োগপদ্ধতি এবং সাধিত্রের ব্যবহারে শিক্ষিত হয়ে যেমন তাদের শ্রমকে অধিকতর ফলপ্রসূ করবে, তেমনই গ্রামের সামাজিক - সাংস্কৃতিক জীবনকে আত্মজিজ্ঞাসু, পরীক্ষাপরায়ণ

এবং প্রাণবন্ত করে তুলবে। অর্থাৎ প্রকৃতির সঙ্গে আত্মীয়তা, জ্ঞানের সূত্রে বিশ্বের সঙ্গে ভাবের আদানপ্রদান, বিবিধ চাকলার চর্চার ভিতর দিয়ে নিহিত সৃজনীশক্তির এবং রূপবোধের বিকাশ এবং প্রযুক্তিবিদ্যায় দীক্ষা নিয়ে গ্রামের উজ্জীবনে কর্মযে াগের সাধন --- এই চতুরঙ্গ উদ্যোগের ভিতর দিয়ে তিনি শান্তিনিকেতন -- শ্রীনিকেতনকে মনুষ্যত্ববিকাশের একটি আশর্চ্য চর্যাক্ষেত্র রূপে গড়তে চেয়েছিলেন। এ ছাড়া আরো কিছু সূত্র ছিল, কিন্তু আপাতত এই চতুরঙ্গের উল্লেখই যথেষ্ট মনে করি।

চিন্তাশক্তি অথবা কর্মশক্তি কোনো ক্ষেত্রেই রবীন্দ্রনাথের খামতি ছিল না। তবু যে এই অতুলনীয় উদ্যোগ তাঁর প্রয়াসের পূর্বেই স্তিমিত হতে শু করে তার কারণ নানা। বিস্তারিত আলোচনায় সময় হাতে নেই। শুধু কয়েকটির উল্লেখ করি। যে স ামাজিক পরিবেশের মধ্যে তাঁর জীবন কেটেছে সেই সমাজের যে স্তর বা বর্গের সঙ্গে তাঁর নিত্যনৈমিত্তিক যোগাযোগ, সেখ ানকার মানুষ মনুষ্যত্বের বিকাশ নিয়ে কোনোদিন মাথা ঘামায় নি, তাঁর সমকালেও ঘামাতো না। তাদের জীবনের উদ্দেশ্য ডিগ্রী অর্জন, স্থায়ী এবং উঁচু মাইনের চাকরি, সমাজে নিজের মাতববরি টিকিয়ে রাখা। পড়ুয়া বাড়ল, অভিভাবকদের চ াপ, মৃত্যুর কয়েকবছর আগে সে চাপের কাছে রবীন্দ্রনাথকেও হার মানতে হল। দীর্ঘ জীবনের গভীর চিন্তা এবং অভিজ্ঞত ার ভিতর দিয়ে যে সংস্কৃতিমান এবং মুক্তবুদ্ধি সমাজ এবং বহুমাত্রিক শিক্ষা পরিকল্পনা আকার নিয়েছিল, তার শুদ্ধতা তিনিও শেষ পর্যন্ত বজায় রাখতে পারেন নি।

গ্রামীণ পরিবেশে বিশ্ববিদ্যালয়ের যে অভিনব পরিকল্পনা তিনি করেছিলেন আরো দুটি দিক থেকে তা আঘাত পেল। এ দেশে যে সব বিবুধান ব্যক্তি তাঁর বন্ধু ছিলেন তাঁদের ভিতরে অনেকেই তাঁর এই উদ্যোগে সহকর্মী হতে রাজি হলেন না। তাঁদের যুক্তি ছিল, জ্ঞানের চর্চা একাগ্র হওয়া দরকার, ফালতু অন্যদিকে মন এবং সময় দিলে সে চর্চা ব্যাহত হয়। অন্তত বিশ্ববিদ্য ালয়ের স্তরে বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিরা কয়েক বৎসরের নিছিদ্র শিক্ষার দ্বারা পরবর্তী প্রজন্মের বিশেষজ্ঞদের তৈরি করে দিয়ে য াবেন এটাই প্রত্যাশিত। তাতে শিক্ষারমান উচচগামী হবে, অর্জিত জ্ঞানের নির্ভরযোগ্যতা বৃদ্ধি পাবে। বিদেশ থেকে যে সব জ্ঞানজ্যেষ্ঠ ব্যক্তিরা এসেছিলেন তাঁরা বেশিদিন টিঁকতে পারেন নি --- কারণ বিদ্যার্জনে যে নিবিষ্টতা জরি শান্তিনিকেতনের ঢিলেঢালা আবহাওয়ার পড়ুয়াদের কাছে তা পাওয়া সম্ভব ছিল না। বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রজীবনের অভিজ্ঞতা না থাকায় রবীন্দ্রনাথ হয়তো সমস্যাটা ঠিকমতো বুঝতে পারেন নি। তাঁর ডাকে বিদেশ থেকে নানা প্রবুদ্ধ ব্যক্তি এসেছেন, কিন্তু তাঁদের কাছ থেকে একনিষ্ঠ পর্যেষণে উচচস্তরের শিক্ষা গ্রহণ করার উপযুক্ত ছাত্র শান্তিনিকেতনের আবহাওয়ায় বড় একটা তৈরি হয় নি।

অন্য আঘাত এল শেষ জীবনে। এল্‌ম্‌হার্স্টকে সঙ্গী পেয়ে মস্ত উদ্যমে তিনি শ্রীনিকেতন গড়ায় হাত দিয়েছিলেন। তাঁর আশ াছিল শ্রীনিকেতনই ক্রমে শান্তিনিকেতনের পরিপূর্ণ বিকাশের উৎস হয়ে উঠবে। উচচবর্ণ এবং নিম্নবর্ণ, মুষ্টিমেয় শিক্ষিত এবং শিক্ষাবঞ্চিত জনগণ, গ্রামবাসী এবং নগরবাসীদের মধ্যে যে ব্যবধান ভারতীয় সমাজকে বিভেদাক্রান্ত এবং গতিহীন করে যে শিক্ষক এবং শিক্ষাকর্মী সম্প্রদায় গড়ে উঠেছিল শ্রীনিকেতনের কর্মকাণ্ডের সঙ্গে যুক্ত হতে তাদের কিছুমাত্র আগ্রহ নেই। বস্তুত ভারতে ব্রাহ্মণ্যধর্ম যে বর্ণভেদ ব্যবস্থার উদ্ভাবন করেছিল আধুনিক শিক্ষা তার বিলোপ না ঘটিয়ে নবীনতর র ূপে তারই বলাধান করে। বিশ্বভারতী কেন্দ্রিক শান্তিনিকেতনের চোখে শ্রীনিকেতন দেখা দেয় নিম্নবর্ণের ব্যাপার বলে--- কী অধ্যাপক - অধ্যাপিকা, কী কুলীন ছাত্রছাত্রী সে পথ মাড়ান না। বিশ্বভারতী কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয় হবার পর নাক - উঁচুর এই গূঢ়ৈষা প্রবলতর হয়েছে।

আসল কথা যে সমাজ পরিবেশ রবীন্দ্রনাথ তাঁর পরিণত শিক্ষাচিন্তাকে রূপ দিতে চেয়েছিলেন সেটি ছিল একেবারেই তাঁর আদর্শের পরিপন্থী। পরম্পরাশ্রয়ী একটি অচলায়তন সমাজকে কী ভাবে আমূল রূপান্তরিত করা যায় সেটি একটি বিরাট এবং জটিল প্রশ্ন। এ সম্পর্কে আমি অন্যত্র কিছু কিছু আলোচনা করেছি। এখানে শুধু এটুকুই বলতে চাই যে রবীন্দ্রনাথ একটি অভিনব, মহাপ্রতিশ্রুতিসম্পন্ন এবং ক্রমবিবর্তনশীল উদ্যোগে জীবনের শেষ চল্লিশ বছরের অনেকটাই ব্যয় করেছিলেন। শেষ জীবনে তার বিরাট দায়িত্ব গুভার হয়ে উঠেছিল। তাঁর সবচাইতে বড় ব্যর্থতা এটাই তিনি পরবর্তী প্রজন্মের এমন কিছু ছাত্র - তথা- কর্মী গড়ে দিয়ে যেতে পারেন নি এই গুভার বহনের যারা যোগ্য। উচচভিলাষীরা শা ন্তিনিকেতন ত্যাগ করে চলে গেছে। যারা রয়ে যায় তাদের মধ্যে অধিকাংশের মূলধন গুদেবের নামজপ এবং পুণ্যস্মৃতি।

রবীন্দ্রনাথের জীবদ্দশাতেই বিশ্বভারতীর জন্য সরকারি অর্থসাহায্য নিতে হয়েছিল। এক দশক পরে এই প্রতিষ্ঠান পুরোপুরিই

কেন্দ্রীয় সরকারের দাক্ষিণ্যের উপরে নির্ভরশীল হয়। এখানে যাঁরা অধ্যাপক এবং কর্মী হয়ে আসেন রবীন্দ্রনাথের উদ্যোগে না থাকে তাঁদের আস্থা, না মনে কোনো বিকল্প আদর্শ। কিছু কিছু অনুষ্ঠান টিকে থাকে, কিছু কিছু দাগাবোলানো এখনও চলে, কিন্তু দাগাও ক্রমেঝাপসা হয়ে এসেছে। যাঁরা একে একে উপাচার্য হিসেবে এসেছিলেন, তাঁদের ভিতরে অনেকেই বিশেষ গুণী ব্যক্তি। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের চতুরঙ্গ উদ্যোগের মহৎ এবং অপ্রতিম পরিকল্পনাটির পুনর্জ্জীবন ঘটাবার মতো ভাবুকতা, সংগঠনশক্তি, প্রাণপ্রাচুর্য, সাহসিকতা, নেতৃত্বশক্তি এক কথায় কারিজ্‌মা তাঁদরে কারোই ছিল না। কেউ - বা অবক্ষয়কে খানিকটা ঠেকা দিয়ে রেখেছিলেন , অনেকে তার পথ প্রশস্ত করে দিয়েছেন।

আমি শান্তিনিকেতনের ছাত্র নই, কিন্তু ছাত্রাবস্থায় শান্তিনিকেতনের সূর্যাস্ত - সমারোহ আমি দেখেছি। পঞ্চাশের দশকে যখনশান্তিনিকেতনে যাই তখনই তার দিশাহারা দশার কিছুটা আভাস পেয়েছিলাম। প্রায় বিশ বছর ভারতের বাইরে অধ্যাপনা - গবেষণার পর শান্তিনিকেতনে ফিরি। অল্প সময়ের ভিতরেই অনুভব করি, বিশ্বভারতী পর্যবসিত হয়েছে একটি প্রায় গ্রাম্য দলাদলির জায়গায় বিশ্বে যেখান থেকে বলতে গেলে এক রকম বিতাড়িত। শুধু কলাভবনই তখনও পর্যন্ত প্রাণবন্ত। অল্প কিছুকাল আমিও রবীন্দ্রভবনে প্রাণসঞ্চারের চেষ্টা করেছিলাম। তারপর গত বিশ বছর ধরে গভীর বেদনার সঙ্গে লক্ষ করে আসছি আপজাত্য কীভাবে শান্তিনিকেতন, শ্রীনিকেতন ও বিশ্বভারতীকে দ্রুত গ্রাস করছে। সরকারি পর্যটন বিভাগের বিজ্ঞাপনের দৌলতে শানিতনিকেতন ক্রমে পর্যবসিত হয়েছে কলকাতার হঠাৎ - নবাবদের সপ্তাহান্তে হুল্লোড়ের জায়গায়। উচ্ছেদ ঘটেছে সাঁওতালদের, লুপ্ত হয়েছে খোয়াই, সঙ্গীতভবনের শিক্ষিকারা ব্যস্তকলকাতায় প্রতিষ্ঠা লাভের চেষ্টায়, কলাভবনের অধ্যাপকের মধ্যে প্রতিযোগিতা, বিশ্বের বাজারে গড়ে উঠেছে অনাবাসী ভারতীয়দেরএক বিলাসবহুল নয়া শহর যা শান্তিনিকেতনকে গ্রাস করতে লালায়মান। তাদের সঙ্গে যোগ গিয়েছে কলকাতার উঠতি নবাবরা। সরকারি প্রশ্রয়ে ডেভেলপমেন্টের নামে শান্তিনিকেতন পর্যবসিত হতে চলেছে বিত্তবানদের জন্য পরিকল্পিতভাবে গড়ে তোলা একটি চিহীন, নীতিবোধরিক্ত, অপচয়ধর্মী বিলাসাশ্রমে।

ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করলে মনে খুব একটা ভরসা জাগে না। তবে সংকট তো শুধু শান্তিনিকেতনের নয়, শিক্ষার এবং জীবনচর্যার ক্ষেত্রে সংকট সারা পৃথিবী জুড়েই দেখা দিয়েছে। হয়তো এই সংকটের চেতনা এবং সংকট থেকে উত্তরণের প্রয়াস শিক্ষার উদ্দেশ্য এবং উপায় নিয়ে নতুন করে ভাবনার জন্ম দিতে পারে। সেক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকে অনেক কিছু গ্রহণ করবার প্রয়োজন ঘটবে। জ্ঞানের চর্চায় শিক্ষক এবং ছাত্রের পারস্পরিক সমৃদ্ধায়ন; শিক্ষার কর্মকাণ্ডের জ্ঞানার্জন এবং চিন্তনের সঙ্গে অনুভূতি, কল্পনা ও সৃজনশীলতার যোগসাধন; জাতীয় সংস্কৃতির ঐতিহ্যকে সমগ্র বিশ্বের সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকারের পরিপ্রেক্ষিতে অবলোকন; এবং প্রাকৃতিকও সামাজিক পরিবেশের সুস্থ এবং সমৃদ্ধ বিবর্ধনে শিক্ষক এবং ছাত্রসমাজের বিশেষ দায়িত্বের চেতনা --- এ সবই আশি বছর আগে যতটা সময়োচিত ছিল আজও ততখানি আছে। কিন্তু এ জন্য যে ব্যাপক ভাবান্দোলন দরকার শান্তিনিকেতনে তার আভাসমাত্র পাই না। তবে এই নবীন শতকে যদি শিক্ষার ক্ষেত্রে এমন কোনো ভাবান্দোলন অন্যত্র সূচিত হয়, তার ঢেউ হয়তো শানিতনিকেতনেও এসে লাগতে পারে। অন্তত সেই আশা চার কুড়ি বছর পেরিয়েও এখনও ছাড়তে পারি নি।

সৃষ্টিসন্ধান

Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com